বিবেকানন্দ

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র,
সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৯২৯

মূল্য তিন আনা

স্বামী বিবেকানন্দ

কলিকাতা সহরে সিমলা নামে একটা পল্লী আছে। সিমলার একটা পথের নাম গৌর মোহন মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট। বিশ্বনাথ দত্ত এই রাস্তার উপরের একজন অধিবাসী; তিনি এটর্ণি ছিলেন। বিশ্বনাথ যেমন ধার্ম্মিক, তেমনি উদারচিত্ত ও তীক্ষ্নবুদ্ধি ব্যক্তি। তাঁহার স্ত্রীর নাম ভুবনেশ্বরী। তিনিও শিক্ষিতা, ভক্তিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন।

এটর্ণির কাজে প্রচুর পয়সা আসিত, সুতরাং বেশ স্বচ্ছল ভাবেই দত্তমহাশয়ের সংসার চলিতেছিল। অর্থের অনাটন বা খাওয়াপরার ভাবনা না থাকিলেও বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরীর মনে একটা দারুণ কষ্ট ছিল। শত স্বচ্ছলতায় সে অভাব পূরণ হইত না। অভাব—বিশ্বনাথের পুত্র সন্তান জন্মিল না।

পুত্রের আকাঙ্ক্ষায় ভুবনেশ্বরী মনে প্রাণে ঠাকুরদেবতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। ৺কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের বহু আরাধনার পর বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরীর বাসনা সফল হইল। বাঙ্গালা ১২৭৩ সনের পৌষ মাসের ২৯ শে (১৮৬৩ খৃঃ অঃ ১২ই জানুয়ারী) সংক্রান্তি দিন তাঁহাদের এক পুত্র সন্তান জন্মিল। শিশুর জন্মে বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরীর হৃদয়ে যে কি আনন্দের সাগর উথলিল তাহা আর বলিবার নহে। শিশুর

মুখশ্রী ও দেহের গঠনে মা বাপের মনে ভোলা মহেশ্বরের কথাই জাগিয়া উঠিত। বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় পুত্র লাভ হইল মনে করিয়া ভক্তিগতপ্রাণ মাতা পিতা শিশুটীর নাম রাখিলেন "বীরেশ্বর"। শুভ অন্নপ্রাশনের সময় উহার নামকরণ হইল নরেন্দ্র নাথ।

পরম যত্ন ও আদরের সহিত—ভক্ত মাতাপিতা দেবতারই মত শিশুর লালন পালন করিতে লাগিলেন। ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ বা সমাজ সামাজিকতার বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহারা কোন দিন শিশুর কোন কাজে বাধা দিতেন না কিংবা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন না বা গালি দিতেন না। তাঁহারা নীরবে হাসিমুখে শিশুর সকল কার্য্য দেখিয়া যাইতেন।

এমন কি শিশুটী মুসলমানের নিকট হইতে সন্দেশ লইয়া খাইতেছে বা তাহাদের হুকা লইয়া তামাক টানিতেছে, বহুবার এরূপ ঘটনা চক্ষে পড়িলেও—বা কেহ সে বিষয় লইয়া কথা বলিলেও—বিশ্বনাথ শিশুকে কোন কিছু বলেন নাই। বিশ্বেশ্বরের আরাধনায় পাওয়া পুত্রটী তাঁহাদের এমনি প্রিয়—এমনি আদরের ছিল।

মা বাপের উদার আচরণ, ধার্ম্মিকতা ধীরে ধীরে শিশুর প্রাণে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ভিক্ষার্থী কিংবা সাধুসন্ন্যাসী বাড়ীতে আসিলে হাতের কাছে যাহা পাইত—তাহা যত কেন দরকারী বা মূল্যবান না হউক—শিশু তাহাই তাঁহাদিগকে দিয়া ফেলিত। এ বিষয়ে সে কাহারও কোন বাধা মানিত

না। অনেক সময় জানালা দিয়া ভিক্ষুককে ঘরের দ্রব্য ছুড়িয়া দিত। এই বাল্যকালের আচরণ হইতেই শিশুর ভাবী জীবনের অবস্থা বেশ বুঝা যাইতেছিল। বাস্তবিক যিনি দরিদ্রের সেবার জন্যই নিজের সমুদয় সুখ ও শক্তি ব্যয় করিয়া গিয়াছেন তাঁহার পক্ষে শিশুবয়সে এইরূপ দান করা খুবই স্বাভাবিক।

অত্যন্ত আদর পাইয়া এবং কখনও কাহারও কাছ থেকে কোন প্রকার বাধা না পাইয়া শিশুটী সর্ব্বপ্রকারে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মা-বাপ কিন্তু শিশুর কোন কাজে বাধা না দিয়া তাহাকে সর্ব্বদা আগুলিয়া রাখার জন্য দুইটী চাকরাণী রাখিয়া দিলেন।

ক্ষুদ্র চারাটী দেখিয়া যেমন ভাবী গাছটা কেমন হইবে তাহা বুঝা যায়, তেমনি শিশুবয়সের আচার ব্যবহার দেখিয়া মানুষটা বড় হইলে কিরূপ হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সাধু-সন্ন্যাসী, ফকীর-ভিক্ষুক বাড়ী আসিলে শিশু কি ভাবে তাহাদিগকে ঘরের দ্রব্যাদি দিয়া ফেলিত তাহা আগেই বলিয়াছি। এই দান ও দয়া যেমন শিশুর সমুদয় হৃদয় জুড়িয়া ছিল—তেমনি শিশুকালের খেলার ব্যাপারে ইহার একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল। অন্য ছেলেমেয়ের ন্যায় ঘর সংসার, রান্নাবাড়া বা ঘোড়া ঘোড়া না খেলিয়া শিশুটী তাহার খেলার সাথীদিগকে লইয়া ধ্যানে বসিয়া যাইত। সাথীরা সকলেই ইহার ন্যায় আসন করিয়া চোখ বুঁজিয়া স্থিরভাবে বসিত।

এইটাই শিশুর অতিশয় প্রিয় খেলা ছিল—খেলার সুযোগ পাইলেই সে এই খেলা খেলিত।

ধ্যানের খেলায় সাথীদের তেমন মন লাগিত না—তাহারা খেলার খাতিরেই উহা করিত। শিশু বীরেশ্বর কিন্তু ধ্যানে ডুবিয়া যাইত—তাহার তখন আর বাহিরের কোন ব্যাপারে খেয়াল থাকিত না।

একদিন সন্ধ্যার পর ছাদে আর আর শিশুর সহিত মিলিয়া ধ্যানের খেলা হইতেছিল। সকলেই চোখ বুঁজিয়া ধ্যানে বসিয়া গিয়াছে, এমন সময়ে একটা ফণাধারী সাপ সহসা সেখানে হাজির হইল। একজন খেলার সাথী ইহা দেখিয়াই ভয়ে যেমন 'সাপ' 'সাপ' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—অমনি আর আর ছেলেরা সবাই দৌড়িয়া পলাইল; কিন্তু বীরেশ্বরের ধ্যান ভাঙ্গিল না। সে ধ্যানেই তন্ময় হইয়া বসিয়া রহিল। খবর শুনিয়া বাড়ীর লোক জন তাড়াতাড়ি ছাদে আসিলেন। আসিয়া দেখেন কি সর্ব্বনাশ! সাপটা ফণা মেলিয়া বীরেশ্বরের মাথার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বীরেশ্বর—চক্ষু বুঁজিয়া ভোলা মহেশ্বরের মত নীরব নিথর ভাবে বসিয়া রহিয়াছে। শিশুটী যে একটু অসাধারণ—সে ধারণা বাড়ীর সকলের মনেই ছিল; সুতরাং কেহই সাপটাকে দূর করিতে চেষ্টা করিল না। একটু পরে সে ফণা গুটাইয়া চলিয়া গেল। শিশু বয়সের এই ধূলাখেলার একাগ্রতা হইতেই বুঝা যাইতেছিল বয়স বৃদ্ধির সহিত বীরেশ্বর একটা মানুষের মত মানুষ হইবে।

নরেন্দ্রের বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাহাকে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পাঠশালায় পাঠান হইল। পাঠশালার শিক্ষার দুর্গতি—বিশেষতঃ নরেনের মত দুর্দ্দান্ত চঞ্চল প্রকৃতির ছেলের, দুষ্ট ছেলের সহিত মিশিয়া যে অধঃপাতের একশেষ হয় তাহা দেখিয়া বিশ্বনাথ উহাকে পাঠশালা ছাড়াইয়া আনিলেন। শিক্ষক রাখিয়া দিয়া বাড়ীতেই পড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

শিক্ষক পড়া বলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেই নরেন্দ্রনাথ চক্ষু বুঁজিয়া তাহা শুনিতে আরম্ভ করিত। বাহিরে জিনিষ পত্রে বা সাথী পড়ুয়াদের কাজকর্ম্মে চক্ষু পড়িলে মন সেই দিকে যায়—পড়ার ব্যাপারে ভালরূপ মন লাগে না—শিশু নরেন্দ্রনাথ তাহা বেশ বুঝিয়াছিল—তাই সে মনটাকে সকল ব্যাপার থেকে টানিয়া একাগ্র করিবার জন্য চোখ বুঁজিয়া পড়া শুনিত। শিক্ষকটী মনে করিত যে, ছেলেটার ইহা বুজরুকি —পড়ার কথা শুনিলেই উহার ঘুম পায়। সুতরাং একদিন তিনি নরেন্দ্রকে এজন্য বিশেষ তাড়না করিলেন এবং সে যে ভয়ানক অমনোযোগী তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য সেদিনের পড়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

শিক্ষকের ব্যবহারে নরেনের প্রথমে বেশ একটু রাগ হইয়াছিল—তাহা তার চক্ষুর ও মুখের ভাবেই বুঝা গেল। অমনোযোগী দুষ্ট ছেলের এইরূপ ক্রোধের ভাব দেখিয়া শিক্ষকের মেজাজও বেশ গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু নরেন যখন শিক্ষকের সমুদয় কথা মুখস্থ করা পড়ার মত বলিয়া গেল—

তখন শিক্ষক মহাশয়ের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না—তাঁহা মনের সেই দারুণ গরম ভাব একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল! তদবধি তিনি নরেন্দ্রকে আর কিছু বলিতেন না।

শৈশবের এই দয়া, ধ্যানধারণা ও স্মৃতিশক্তি, বয়স বৃদ্ধির সহিত খুব প্রখর হইল। এই তিনটির বলেই নরেন্দ্রনাথ ভাবীকালে একটা বিশ্ববিখ্যাত লোক হইয়াছিলেন।

শিশুবয়স হইতেই নরেন্দ্রনাথ চক্ষু বুঁজিলে বা ঘুমাইলে স্বপ্নে দুই চোখের মাঝখানটায় একটা আলোক দেখিতে পাইত। সে অনেকের নিকট সে কথা বলিত। তারপর একটি গুরু ভাইকেও সে ঐরূপ আলোক দেখাইয়াছিল।

নরেন্দ্রনাথকে প্রথমে যখন স্কুলে ভর্ত্তি করা হয়—তখন সে বড়ই গোলযোগ বাধাইয়াছিল। ইংরেজী বিদেশী ভাষা—উহা সে পড়িবে না বলিয়া খোট ধরিয়া বসিল। শেষে অনেক বুঝানের পর সে ইংরেজী পড়িতে রাজি হইল। যে ইংরেজী পড়িবে না বলিয়া নরেন্দ্রনাথ কাঁদিয়া স্কুল থেকে বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিল—সেই ইংরেজীতে শেষে সে কত বড় পণ্ডিত হইয়াছিল—আর সেই ইংরেজীর জোরে সে কি ভাবে জগৎ জয় করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছে।

নরেন্দ্রের দেহে ও মনে এমন একটা শক্তি ছিল—যাহার বলে সে—যে বিষয় যখন ধরিত তাহাতেই সর্দ্দার হইয়া উঠিত। বাস্তবিক বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া, খেলাধূলা, গান বাজনা প্রভৃতি সকল বিষয়ে অগ্রণী হইয়া উঠিল। অনবরত কর্ম্মে

ব্যস্ত থাকাই নরেন্দ্রের একটা বিশিষ্ট স্বভাব ছিল। অথচ সেই সকল কাজে তাহার উৎসাহের অবধি থাকিত না।—উদ্দীপনার অন্ত থাকিত না—সর্ব্বোপরি আনন্দের বন্যায় ভাসাইয়া নরেন্দ্রনাথ—সকলকে দিয়া অতি বড় কঠিন কাজও অনায়াসে করাইয়া লইত।

আগেই বলিয়াছি যে তাহার মনে রাখিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। যাহা একবার পড়িত, তাহা সে কখনও ভুলিয়া যাইত না। বড় বড় বই সে একদিনে অনায়াসে পড়িয়া ফেলিত এবং সমুদয়টা মনে রাখিতে পারিত।

নরেন্দ্র মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসনে পড়িত। পেটের পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ায় নরেন্দ্রকে দুই বছরকাল পড়া ছাড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। শেষে পুনরায় বহু দরবারের পর সে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, সেবার স্কুল হইতে একমাত্র নরেন্দ্রই প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছে। এই সময়ে নরেন্দ্রের বয়স সতর বছর মাত্র।

২

বয়স যত বাড়িতে লাগিল—নরেন্দ্রনাথের গায়ের বলের সহিত মনের বলও ততই বাড়িতে লাগিল। স্কুল ছাড়িয়া যখন সে কলেজে পড়িতে গেল, তখন কলেজের সমপাঠীদিগকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ আলোচনা-সমিতি গড়িত—নিজে সে সভায় বক্তৃতা করিত। সমপাঠীরা দেখিত—তাহারা কেহই নরেনের মত

মনমাতান কথায়—তেমন অদ্ভুত ভাষাতে ও উদ্দীপনার সহিত কোন বক্তৃতা করিতে পারে না। কি কলেজের পড়ার বিষয়—কিবা লোকসেবা—কিবা অন্য বিষয়, যখন যেটার আলোচনা আরম্ভ হউক না কেন, নরেন্দ্রনাথ সেই বিষয়েই সকলের মন আকর্ষণ করিতে পারিত—অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিত।

ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের দিকে নরেন্দ্রনাথের ঝোঁক পড়িল। কলেজের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিল। নরেন্দ্রের গলার আওয়াজ অতি মিষ্ট ছিল—তার উপর সে একজন খুব ভাল গাইয়ে ছিল। ভক্তি-ভাবপূর্ণ ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে গাইতে নরেন্দ্রনাথ আপনা ভুলিয়া যাইত—যে সেই মধুরকণ্ঠনিঃসৃত গান শুনিত সেইই মুগ্ধ না হইয়া পারিত না।

গীতা এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের নিত্যসহচর ছিল, প্রতিদিন গীতা পাঠ করিত। ধর্ম্মের দিকে তাঁহার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মসমাজের সাধন-ভজনে তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা মিটিত না—নরেন্দ্রনাথ যাহা জানিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল ব্রাহ্মসমাজের কেহ তাহার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না।

এদিকে ইংরেজী দর্শন-শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ নাস্তিক হইয়া উঠিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের জ্ঞান-পিপাসা তাহাতে মিটিল না—ইংরেজী দর্শনশাস্ত্র তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমে ক্রমে চঞ্চলপ্রকৃতি নরেন্দ্রনাথ অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল, সে যাহা চাহে তাহা না পাইয়া ব্যাকুলভাবে কাল কাটাইতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ যে শুধু বই পড়িয়া তাহা মনে রাখিতে পারিত তাহা নহে, যাহা পড়িত, তাহার সবটুকু যুক্তির সহিত বুঝিয়া লইত। তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে দিত না। নরেন্দ্রনাথ কি ভাবে পাঠ্য পুস্তক পড়িত এবং নিজের যাহা বলিবার থাকিত তাহা সে কি ভাবে লোককে নির্ভয়ে বলিত—সে সকল বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। এই ভয়হীনতা ও স্পষ্ট কথা বলার স্বভাব তাহার বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পায়।

হারবার্ট স্পেন্সার নামে একজন খুব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি একজন দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত। পৃথিবীর সকল দেশের পণ্ডিত সেই স্পেন্সারের লেখা দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়া থাকে। স্পেন্সার-প্রণীত দর্শনশাস্ত্র এদেশের কলেজে পড়ান হয়। নরেন্দ্রনাথ স্পেন্সার সাহেবের বহি পড়িয়া তিনি যে দর্শনশাস্ত্রের নূতন নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহার একটী বিষয়ে নিজের মত লিখিয়া জানান। নরেন্দ্র তখন কলেজে এফ্ এ পড়ে মাত্র—তবু সে স্পেন্সারের ন্যায় জগৎবিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে নিজের মত লিখিয়া জানাইতে সঙ্কোচ বা ভয় পাইল না। স্পেন্সার সাহেব সেই মন্তব্য পড়িয়া—নরেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পত্রের উত্তর দেন এবং সত্য নির্ণয়ের জন্য বিশেষ উৎসাহিত করেন।

ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াও যখন নরেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম পিপাসা মিটিল না—কেবলি ঈশ্বরকে জানিবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সেই সময়ে একদিন সিমলায় রামকৃষ্ণ পরমহংস

আসেন। নরেন্দ্র গান গাহিবার জন্য তথায় যাইয়া পরমহংসের সহিত পরিচিত হয়।

পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত নরেনের আত্মীয়। তিনি নরেনের মনের ভাব জানিয়া উহাকে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে যাইতে উপদেশ দিলেন। নরেন সাত পাঁচ ভাবিয়া দক্ষিণেশ্বরে গেল।

পরমহংসদেব যুবক নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বলিলেন নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধ পুরুষ। নরেন্দ্রের কিন্তু তখন পরমহংসদেবের উপর তেমন আকর্ষণ ছিল না। তবে এই সাধুটীর সরল ও মধুর কথা, এবং ব্যবহার বেশ ভাললাগিত। এইভাবে নরেন্দ্র একদিকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিত, আবার একটু অবসর পাইলেই পরমহংসদেবের নিকট চলিয়া যাইত। সময় সময় ধ্যান করিতে বসিয়া এমনি তন্ময় হইয়া পড়িত যে, নিজের একটা শরীর যে আছে সে বোধই তাহার থাকিত না।

নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন একুশ বছর তখন সে জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় পাশ হইল। পিতা বিশ্বনাথ এটর্ণি—আইন-ব্যবসায়ী, সুতরাং নরেন্দ্রও অইন পড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই বিশ্বনাথ দত্ত দেহত্যাগ করিলেন। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন তাহাই প্রায় ব্যয় করিতেন—সুতরাং সঞ্চয় কিছু থাকিত না। তাঁহার মৃত্যুর পর অর্থাভাবে তদীয় পরিজনবর্গের বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল।

সুযোগ পাইয়া জ্ঞাতিরাও সেই কষ্টের পরিমাণ বাড়াইয়া তুলিল।

শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, নরেন্দ্র ও মা ভাই প্রভৃতির কোন কোন দিন—আহার ঘটিত না। তবু কিন্তু নরেন্দ্র কাহারও নিকট কিছু চাহিত না—কিংবা নিজেদের অভাবের কথা কাহারও কাছে বলিত না। বরং কেহ উপযাচক হইয়া নরেন্দ্রকে খাইতে বলিলেও সে যে কোন উপায়ে সেখান থেকে না খাইয়াই বাড়ী ফিরিত।

বিশ্বনাথ দত্ত অনেক বার নরেন্দ্রনাথের বিবাহের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের কিন্তু বিবাহ করিতে মোটেই ইচ্ছা ছিল না—আবার ঈশ্বরের ইচ্ছায় যতবার তাহার বিবাহের চেষ্টা হইয়াছে ততবারই একটা না একটা ঘটনায় চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে। পিতার মরণের পর—নরেন্দ্রের আর সে ভয় রহিল না। পরমহংসদেবের কাছে বার বার যাওয়া আসা করায় এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া নরেন্দ্র মনে মনে বেশ দৃঢ়ভাবে স্থির করিয়াছিল যে, সে বিবাহ করিবে না—সন্ন্যাসী হইবে। পিতার মৃত্যুতে সন্ন্যাসী হওয়ার পথটাও বেশ খোলসা হইল।

ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল—তাঁহার কাছে না গেলে যেন কিছুতেই মনে শান্তি পাইত না। আবার পরমহংসদেবও নরেন্দ্রের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, একদিন সে তাঁহার কাছে না গেলে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। তিনি নরেন্দ্রের মধ্যে নারায়ণকে

প্রত্যক্ষ করিতেন। কখন কখন বলিতেন—“তুই শিব, আমি শক্তি।”

নরেন্দ্রনাথ যখন ঈশ্বর দর্শনের জন্য বড় পাগল, তখন একদিন সে পরমহংসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “আপনি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?”

রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলিলেন—“হাঁ দেখিয়াছি। এই তুই যেমন আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছিস্, তোকে যেমন আমি দেখিতেছি—এমনি আমি তাঁকে দেখিতে পাই। শুধু কি আমিই তাঁকে দেখিতে পাই, তোকেও আমি দেখাইতে পারি।” নরেন্দ্রনাথ বহু লোককে এমন প্রশ্ন করিয়াছিল, কিন্তু কেহই এরূপ উত্তর দিতে পারে নাই। তাই পরমহংসদেবের কথায় সে যেমন আশ্চর্য্যান্বিত হইল তেমনি আনন্দিতও হইল।

রামকৃষ্ণদেব বড় উচিতবক্তা চিলেন, সত্য কথা বলিতে তিনি কাহারও মুখ চাহিতেন না। নরেন্দ্রনাথও তেমনি উচিতবক্তা ছিল—এমনকি পরমহংসদেবকেও সে কোন কথা বলিতে লজ্জা বা সঙ্কোচ মনে করিত না। তিনি নরেন্দ্রের এই সরল ও সাহসিক ব্যবহারে খুব খুসী হইতেন।

ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া, ঘর সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল—ওগুলি আবর্জ্জনা—যথার্থ উন্নতির কাঁটা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই সময়ে পরমহংসদেব কাশীপুর থাকিতেন। নরেন্দ্র বি এল পড়া ছাড়িয়া দিল—কি এক দারুণ টানে পড়িয়া পরমহংসদেবের কাছে চলিয়া গেল। তাহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল পরমহংসদেবই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং

মনে শান্তি দিতে সমর্থ। সুতরাং সে তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিল।

নরেন্দ্র ইংরেজী লেখাপড়া ছাড়িল বটে—কিন্তু নানাশাস্ত্র গ্রন্থ পড়িতে লাগিল। পরমহংসদেবের সরল মধুর উপদেশ শুনিয়া বেদান্তের মূলতত্ত্ব বুঝিয়া লইল। ক্রমে ক্রমে নরেনের মনে দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, সকল ধর্ম্মই সত্য—কোন ধর্ম্মকেই ঘৃণা করা উচিত নহে—সকলপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং সাধনাই বৈদান্তিক ধর্ম্মের সোপান। পরমহংসদেবের পাদমূলে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ সাধন ভজন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহার মন হইতে সংসারের টান কাটিয়া যাইতে লাগিল—ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিল। এই সময়ে পরমহংসদেব দেহত্যাগ করিবার কিছুকাল পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথকে—সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দিলেন।

সাধন ভজন করিতে করিতে যখন সমাধি—অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্ম বোধ হয়, তখন আর তাঁহাদের অন্য কোনরূপ ধর্ম্ম বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান থাকে না। পরমহংসদেবের ঐ অবস্থা হইয়াছিল। তাই তিনি তখন আর কোন কর্ম্ম করিতেন না—করিতে পারিতেন না। কিন্তু শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে তিনি জগতের কল্যাণের জন্য—জীবের মঙ্গলের জন্য সাংসারিক কাজে লিপ্ত হইতে শিক্ষা দিয়া গেলেন। "আপনার মুক্তি অপেক্ষা জগতের কল্যাণ শ্রেষ্ঠ কার্য্য, একটিমাত্র জীবের কল্যাণের জন্য যদি বারংবার কুক্কুর হইয়া জন্মিতে হয়—আমি তাহাতেও রাজী" পরমহংসদেবের এই উক্তি তাঁহার শিষ্য নরেন্দ্রনাথ পালন করিয়া গিয়াছে। গুরু, কর্ম্ম ত্যাগ

করিয়াছিলেন, কিন্তু শিষ্য, দেহত্যাগ পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া গিয়াছে।

রামকৃষ্ণ যৌবনের প্রথমে দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ীতে পূজক ছিলেন। যে জন্মান্তরীণ শক্তি লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন, কালী-পূজা করিতে করিতে তাঁহার সেই শক্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—দেবতা ও প্রাণীতে ব্রহ্মজ্ঞান হইল। তিনি জগতের নরনারীর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইলেন। ক্রমে ক্রমে কালী সাধনা, তান্ত্রিক সাধনা, গোপাল সাধনা, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি এই তত্ত্বে পৌঁছিলেন যে,—জগতের সকল ধর্ম্ম সত্য—কেবল আচরণের ভেদ, জগতের সকল ধর্ম্মের লোক একমাত্র ব্রহ্মেরই উপাসনা করে—কেবল নামের ভেদ। সুতরাং তিনি কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দু-দেবতার মন্দিরে যেমন ভক্তির সহিত যাইতেন—মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান-ব্রাহ্ম প্রভৃতির উপাসনা মন্দিরেও তেমনি যাইতেন—সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোককে সমানে আদর করিতেন।

রামকৃষ্ণ সাধনাদ্বারা যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, মরণের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সেই শক্তি সম্পূর্ণভাবে শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে দান করিলেন। পরের ছেলে যেমন পোষ্যপুত্র সাজিয়া অসীম ধনৈশ্বর্য্যের মালিক হয়, অথচ সেই ধনৈশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিতে তাহার কোন পরিশ্রম বা চেষ্টা করিতে হয় না; নরেন্দ্রনাথও সেইরূপ বিনা চেষ্টায় রামকৃষ্ণদেবের শক্তির অধিকারী হইল।

পুরাণাদি পাঠ করিলে দেখা যায়, শিষ্যগণ গুরুগৃহে যাইয়া গুরুর আদেশমত কেহ ফুলদূর্ব্বা যজ্ঞের কাঠ আনিত, কেহ গরু

রাখিত, কেহবা গুরুর ক্ষেত্রে কৃষির কাজ করিত—পড়া শোনার কাজে বড় লাগিত না। শিষ্যগণের এইরূপ আদেশ পালনের ফলে গুরু সন্তুষ্ট হইয়া হয়ত বলিয়া দিতেন "যাও—গৃহে যাইয়া সংসারী হও, তুমি সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইলে।" গুরুর এই আদেশের ফলে সত্য সত্যই শিষ্য সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইত—তাহাকে আর পড়িতে শুনিতে হইত না। প্রকৃত কথা গুরু সন্তুষ্ট হইয়া শিষ্যকে নিজের বিদ্যা দান করিতে পারিতেন। আমরা এখন সে সকল কথা বিশ্বাস করি না—"আজগুবি গল্প" বলিয়া উড়াইয়া দেই। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধ গুরু যে—ইচ্ছা করিলেই শিষ্যের শরীরে নিজের সমুদয় শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন—নরেন্দ্রনাথ ও পরমহংসদেবের বৃত্তান্তই তাহার বিশেষ প্রমাণ।

মরণের আগে পরমহংসদেব নিজের সমুদয় শক্তি নরেন্দ্রনাথের দেহে সঞ্চারিত করিয়া,—"নরেন্, আজ থেকে আমি সত্যসত্যই ভিখারী হইলাম" এই কথা বলিতে বলিতে সেই শোকদুঃখের অতীত মহাপুরুষ কাঁদিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক, তিনি নিজ-শক্তি দান করিয়া শিষ্যকে অসীম বলে বলবান্ করিয়া দিলেন। সাধন হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মতেজের নিকট সকল শক্তিরই মাথা নোয়াইতে হয়—বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের বিবাদে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। আর পরমহংস-প্রদত্ত ব্রহ্মতেজের বলে নরেন্দ্রনাথও জগতের সকল শক্তির পরাজয় সাধন করিয়াছিলেন—তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

পরমহংসদেব সকলের মনের ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং

কেহ কোন কথা না বলিলেও সকলের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ কথা বলিয়া ফেলিতেন। সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—কিম্বা যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে তাঁহাদের সকলেরই এই অবস্থা ঘটে। এই অন্তর্য্যামীভাবের বলে পরমহংসদেব বহুবার নরেন্দ্রনাথের অন্তরের সন্দেহের উত্তর দিয়াছেন।

বহুলোক রামকৃষ্ণদেবকে অবতার বলিতেন—শিষ্যগণের নিকট তিনি নিজমুখেও কখন কখন সে কথা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু নরেন্দ্রের তাহাতে বিশ্বাস হইত না। অথচ কথাটা খোলা-খুলিভাবে গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিতেও পারিত না। রামকৃষ্ণ কিন্তু সবই বুঝিতেন—সকলই জানিতেন—তথাপি তিনি স্পষ্ট কথায় নরেন্দ্রের সন্দেহের উত্তর না দিয়া, নিজের আচরণ ও উপদেশের ভিতর দিয়া নরেন্দ্রকে সে কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। এততেও নরেন্দ্র তাহা বুঝিত না,—তাহার বিশ্বাস হইত না।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট রবিবার পরমহংসদেব দেহ ত্যাগ করেন। সেইদিন তিনি নরেন্দ্রনাথের সন্দেহ দূর করিয়া যান। সে দিনও গুরুর মৃত্যুশয্যার কাছে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্র ভাবিতেছিল যে, ইনি কি সত্যই অবতার? মরণের আগে যদি নিজমুখে সে কথা বলিয়া যান, তবেই বিশ্বাস করিতে পারি যে ইনি অবতার। অমনি পরমহংসদেব বলিলেন—"নরেন, আজও তোর বিশ্বাস হইল না? যিনি রাম আর যিনি কৃষ্ণ, তিনিই এই দেহে রাম-কৃষ্ণ। এ তোর বেদান্তের ভাব নহে রে সত্য কথা।"

শুনিয়া নরেন্দ্রের সন্দেহ দূরে গেল—চমক ভাঙ্গিল। গুরুর মরণের পর নরেন্দ্র গুরুর প্রতি এইরূপ অবিশ্বাসের জন্য বড়ই অনুতাপ করিতেন।

পরমহংসদেবের অন্তর্দ্ধানের পর নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন ধ্যানধারণায় কাটাইলেন। সকলকে উপদেশ দিবার ভার এক্ষণে তাঁহার উপর পড়িয়াছিল—সুতরাং তিনি গুরুর আদেশ পালনে রত হইলেন। কিন্তু গুরুদেব তাঁহাতে যে শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছিলেন—যে লোকশিক্ষা ও লোকহিতৈষণার বীজ তাঁহাতে বুনিয়া গিয়াছিলেন—অচিরে তাহা অঙ্কুরিত হইল। নরেন্দ্রনাথ আর একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কার্য্যক্ষেত্রের ডাকে বাহির হইতে বাধ্য হইলেন।

৩

পরমহংসদেবের নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন হইতে তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পরিতেন। একেইতো চেহারা অতিশয় সুন্দর ছিল, তাঁহার দেহের উজ্জ্বলবর্ণ, সুবিশাল চক্ষু, উন্নত নাসিকা এবং সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখ-মণ্ডল হইতে যেন অপরিসীম সাহস—একটা তেজ—একটা জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইত। লক্ষ লোকের মধ্যে দাঁড়াইলেও মনে হইত যে, ইনি উহাদের সকলের চেয়ে একটা পৃথক্ পদার্থ। এই অপূর্ব্ব দেহে গৈরিক বেশ যে কি একটা বিস্ময়ের ভাব

লোকের মনে আনিয়া ফেলিত—তাহা বলিয়া বা লিখিয়া বুঝান যায় না।

গুরুর দেহাবসানের পর বিবেকানন্দ ভারত-ভ্রমণে বাহির হইলেন। ভারতের প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান স্থান ভ্রমণ করিয়া দেশবাসীর আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতির সন্ধান লইলেন। এই সময়ে অনেক অলৌকিক ঘটনাও ঘটে, অনেক শিক্ষাও ঘটে।

এইরূপে ঘূরিতে ঘূরিতে তিনি আলোয়ার উপস্থিত হইলেন। তথাকার মহারাজের দেওয়ানের সহিত আলাপ হইল। মহারাজও সংবাদ পাইলেন যে একজন মস্ত ইংরেজী জানা সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। এই ইংরেজী জানা সন্ন্যাসীর সহিত দেখা করিতে মহারাজের ইচ্ছা হইল—তিনি স্বামিজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন।

এই রাজা ইংরেজী বিদ্যায় নহে—ইংরেজী আচার ব্যবহার এবং হাবভাবে পূরা দস্তুর নিপুণ ছিলেন। ধর্ম্মের সামান্য রেখাটুকুও তাঁহার হৃদয়ে ছিল না—শুধু সাহেবদের সহিত শিকার করাই তিনি জীবনের সার করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যেও তাঁহার কোনরূপ মন ছিল না।

মহারাজ আসিয়াই স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনিয়াছি আপনি খুব পণ্ডিত লোক। তবে অর্থ উপার্জ্জন না করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন?

প্রশ্ন শুনিবামাত্র দুর্জ্জয় সাহসী স্বামিজী উত্তর করিলেন—"আপনি রাজকার্য্য না করিয়া শিকার করিয়া বেড়ান কেন?"

স্বামিজীর এহেন উত্তর শুনিয়া উপস্থিত লোকদিগের মন ভয়ে বিস্ময়ে ভরিয়া গেল। রাজাও এই নবীন সন্ন্যাসীর এত বড় জবাব শুনিয়া যেন একটু দমিলেন। তারপর শান্তভাবে বলিলেন "আমার ভাল লাগে তাই ওরূপ করি।"

স্বামিজী উত্তর করিলেন—"আমারও ভাল লাগে তাই একাজ করি।"

তারপর নানা কথা হইল। রাজা স্বামিজীকে বলিলেন যে মূর্ত্তিপূজায় তাহার বিশ্বাস হয় না। ইট, কাঠ, পাথর পূজা করিতে পারেন না। রাজার এই কথা শুনিয়া বিবেকানন্দ দেয়াল হইতে মহারাজার একখানা ছবি নামাইয়া আনিয়া দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছবি কার ?" দেওয়ান বলিলেন "এ মহারাজের ফটো।" বিবেকানন্দ অমনি ঐ ছবির উপর থুথু ফেলিবার জন্য উপস্থিত লোকদিগকে বার বার আদেশ করিলেন। কিন্তু কেহই তাহা করিতে সাহস পাইল না, বিস্ময়ে ও ভয়ে সকলে স্বামিজীর দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন তিনি বলিলেন—"ছবিটার মধ্যেত আর মহারাজ নাই ? তবু যে কেহ ইহার উপর থুথু ফেলিতে সাহস পাচ্ছ না—উহার একমাত্র কারণ এই যে, সবাই মনে কর একাজ করিলে এ ছবিটা যার, তাকে অপমান করা হয়।" তারপর মহারাজকে বলিলেন —"মহারাজ ! ছবিটা আপনি নহেন, কিন্তু ওটা আপনার ছবি। আপনি উপস্থিত না থাকিলেও ঐ ছবিটা দেখিলেই সকলের আপনাকে চেনা হয়। এখানাকে কেহ একটু কাগজ বা ছবি

বলিয়া মনে করে না—আপনার আকারের ছায়া আছে বলিয়া এখানাকে আপনার মতই সম্মান করে। মুর্ত্তিপূজাও এইরূপ। কেহই ইট, কাঠ, পাথরের পূজা করে না, তাদের ইষ্টদেবতার একটা গুণের মুর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করে। সেই মুর্ত্তির মধ্যে তারা ইষ্টদেবতারই ছায়া দেখ্‌তে পায়—ইট, কাঠ, পাথর দেখে না। যাঁরা মুর্ত্তির পূজা করেন, তাঁরা কি কখনও বলেন যে "হে ইট, "হে পাথর, হে কাঠ, আমি তোমাকে পূজা করিতেছি, তুমি আমায় দয়া কর?"

স্বামিজীর উত্তর শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, "আপনি আজ আমার অজ্ঞানতার আঁধার দূর করিলেন—চোখ খুলে দিলেন।"

ভারতভ্রমণ করিতে করিতে স্বামিজীর সহিত ভারতবর্ষের বহু রাজা মহারাজের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মে। সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি দ্বারা এই নবীন সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রতিভার পূজা করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি রাজপুতনার অন্তর্গত খেতরি নামক ক্ষুদ্র রাজ্যে গমন করেন। খেতরি রাজ্য জয়পুর হইতে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজা অজিৎ সিংহ স্বামিজীর অলৌকিক ক্ষমতার নিকট মাথা নোয়াইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। খেতরির রাজার আগ্রহে স্বামিজী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করিলেন।

এখান হইতে তিনি গুজরাট হইয়া বোম্বাই গমন করেন। তথা হইতে মহীশুর, কোচিন, মাদুরা পৌঁছিলেন। সর্ব্বত্রই সমভাবে আদর অভ্যর্থনা ও প্রভূত পূজা পাইতে লাগিলেন।

মহীশুরের মহারাজ স্বামিজীর অগ্নিময়ী বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার পরমভক্ত হইলেন।

সেতুবন্ধ রামেশ্বরের অপর নাম রামনাথ পুরম্। চলিত কথায় সাধারণে উহাকে রামনাদ বলে। মাদ্রাজে গমন করিলে তথায় স্বামিজীর সহিত রামনাদের রাজা ভাস্কর-সেতুপতি মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয়। ভাস্কর-সেতুপতি মহারাজ বিবেকানন্দের বিদ্যাবুদ্ধি, সাধনা ও তেজস্বিতা দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইলেন—তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে আমেরিকার ইউনাইটেড রাজ্যের চিকাগো নামক স্থানে "সর্ব্বধর্ম্ম মহাসভা" নামে এক সভা হইবার সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। পৃথিবীর সকল দেশের ধর্ম্মাচার্য্যগণ উপস্থিত হইয়া তথায় ধর্ম্মালোচনা করিবেন, ইহাই ঐ সভার উদ্দেশ্য। ভাস্কর সেতুপতি মহারাজ স্বীয় গুরু স্বামিজীকে তথায় যাইবার জন্য জেদ ধরিলেন এবং ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

বিবেকানন্দের মন তখন সেতুবন্ধ দেখিবার জন্য পাগল। সুতরাং তিনি রাজার প্রার্থনা পেছনে রাখিয়া আগে রামেশ্বরে গেলেন। তথা হইতে কন্যাকুমারী যাত্রা করিলেন। পথে ভিক্ষা করিয়া পাথেয় সংগ্রহ করিতে করিতে রামেশ্বর হইতে কন্যা-কুমারী গেলেন। তথায় খেয়ার কড়ি ছিল না বলিয়া "জয় মা কালী" বলিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিয়া সমুদ্র খাড়ি পার হইলেন—মন্দিরে যাইয়া পৌঁছিলেন। ভক্ত সাধকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল।

একবার কাশীতে বহু বানর বিবেকানন্দকে তাড়া করিয়াছিল। তিনি ভয়ে পলায়নপর হইলে তাঁহাকে ভীরু মনে করিয়া বানরেরাও বিশেষ ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। তখন জনৈক সন্ন্যাসী পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে "সদর্পে ফিরিয়া দাঁড়াইবার" জন্য উপদেশ দেন। বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলে—বানরের দল পলাইয়া যায়। তদবধি তিনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, 'বিপদকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে নাই, সতেজে ফিরিয়া দাঁড়াইলেই বিপদ দূর হয়।' জীবনে তিনি সন্ন্যাসীর ঐ আদেশ বহুবার পালন করিয়া বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। কন্যাকুমারীতে সমুদ্রের খাড়ি সাঁতরে পার হওয়াও সেই উপদেশের ফলে।

এই ভ্রমণ উপলক্ষে একবার রাজপুতনার এক রেলগাড়ীতে স্বামিজী দুইজন সাহেবের সহিত যাইতেছিলেন। সাহেবেরা মনে করিতেছিল, এই আধনেংটা সাধুটা পরম মূর্খ, সুতরাং দুইজনে মনের সাধে ইংরাজীতে সাধুর শ্রাদ্ধ করিতেছিল—নিতান্ত বর্ব্বরের মত কতরূপ ঠাট্টা করিতেছিল। ইতি মধ্যে গাড়ী একটা ষ্টেশনে থামিলে, স্বামিজী ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট এক গ্লাস জল চাহেন। সাহেবদ্বয় এই সাধুটীর মুখে বিশুদ্ধ ইংরেজী শুনিয়া বুঝিল তাহাদের সমুদয় বর্ব্বরের উক্তিই ইনি বুঝিতে পারিয়াছেন—অথচ সাধুটীর ধৈর্য্য তাহাতে একটুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তখন তাহারা বিস্মিত হইয়া স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিল যে, এত কটূক্তি শুনিয়াও তিনি কিরূপে চুপ করিয়াছিলেন!

স্বামিজী উত্তর করিলেন যে, 'তোমাদের মত মূর্খ আমি অনেক বার দেখিয়াছি, সুতরাং চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত মনে করিয়াছি। যাহারা এতক্ষণ বীরত্বের সহিত একজন নিরীহলোককে সহস্র সহস্র গালি দিয়া কত আনন্দ পাইতেছিল, তাহারা কিন্তু বিবেকানন্দের একটুও গালি সহিতে না পারিয়া চটিয়া লাল হইল এবং মারামারি করিতে উদ্যত হইল। স্বামিজীও 'আও' বলিয়া যেমন আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার সেই সুগোল শিরাপুষ্ট বাহুযুগল দেখিয়া সাহেবদ্বয়ের মনে আর বীররস রহিল না। সুর নামাইয়া সুবোধ বালকের মত স্বামিজীর কাছে ক্ষমা চাহিতে লাগিল।

ছোট, বড়, হিন্দু, অহিন্দু প্রভৃতি সকলের কাছে অতিমাত্র সম্মান ও আদর পাইতে পাইতে স্বামিজী মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন। কথায় আছে "দর্পহারী ভগবান"। ভগবান যে, অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ করেন মান্দ্রাজে তাহার একটা উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল।

সিঙ্গুরা ভেলু মুধলিয়র মান্দ্রাজের খৃষ্টীয়ান কলেজের বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক—নিজেও খৃষ্টীয়ধর্ম্মাবলম্বী। মুধলিয়র মহাশয়ের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ের তর্কে পরাস্ত করিতে পারিবে না। তিনি এইরূপ গর্ব্ব মনে লইয়াই স্বামিজীর সহিত তর্ক করিতে আসিলেন। কিন্তু স্বামিজী সেদিন অল্পকথায়—অতি অল্পসময়ে এমন কতকগুলি কথা কহিলেন যে, সে সকল কথা শুনিয়া মুধলিয়রের মুখ থেকে আর

একটী কথাও বাহির হইল না, কেবল দুইচক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বিবেকানন্দের শিষ্য হইলেন। শেষে "প্রবুদ্ধ-ভারত" নামে ইংরেজী মাসিক পত্র প্রকাশিত করিয়া স্বামিজীর কার্য্যের সহায় হন। নিজে সন্ন্যাস লইয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন।

মাদ্রাজে বিবেকানন্দের বহু শিষ্য জুটিল। শিষ্যগণের আগ্রহে তিনি চিকাগোর "সর্ব্বধর্ম্ম মহাসভাতে" যাইবার জন্য স্বীকৃত হইলেন। ইতিমধ্যে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি হায়দরাবাদে গেলেন, তথায় রাজাধিরাজের মত অভ্যর্থনা পাইলেন। তাঁহার মনোহর বক্তৃতা শুনিয়া সকলে তাঁহাকে আমেরিকা যাইবার জন্য অর্থ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

স্বামিজী কখনও কাহারও কাছ থেকে কিছু লইতেন না। অনুরোধের দায় এড়াইতে না পারিলে বড় জোর একখানা রেলের টিকেট কিংবা একটা গেরুয়া পাগড়ি কিংবা পরিধেয় চাহিয়া লইতেন। অনেক লোককেই উত্তর দিতেন "প্রয়োজন হইলে জানাইব"। হায়দরাবাদের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া নিজামের একজন আত্মীয় স্বামিজীকে এক হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামিজী তাঁহাকেও ঐ উত্তর দিয়াছিলেন।

আমেরিকা যাওয়ার সঙ্কল্প স্থির হইলে, বিবেকানন্দ, পরমহংসদেবের স্ত্রীর নিকট অনুমতি চাহিয়া পত্র লিখিলেন। তিনিও অবিলম্বে আমেরিকা যাইবার জন্য অনুমতি করিলেন। শিষ্যেরা চারিদিক হইতে চাঁদা করিয়া টাকাকড়ি সংগ্রহ করিতে

লাগিলেন। এই সময়ে আর এক প্রবল সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

৪

খেতরির মহারাজের কোন সন্তান ছিল না। রাজা, স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে তিনি রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন "আপনার পুত্র হইবে।" আশীর্ব্বাদ ফলিল, খেতরির রাজার একটি ছেলে হইল। খেতরিতে আনন্দের স্রোত বহিল। রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহনলালকে স্বামিজীর নিকট পাঠাইয়া শুভ সমাচার জ্ঞাপন এবং স্বামিজীকে এই উৎসবে উপস্থিত হইবার জন্য সানুনয় প্রার্থনা জানাইলেন। স্বামিজী তখন চিকাগো যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন। জগমোহনলাল স্বামিজীর মুখে সকল ব্যাপার শুনিয়া বলিলেন—"আমরা আমেরিকা যাইবার সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" সুতরাং আমেরিকা যাইবার ভাবনা গেল। স্বামিজী নিশ্চিন্ত হইয়া খেতরির উৎসবে যাইয়া যোগ দিলেন। নবজাতশিশুকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা অজিৎ সিং প্রাণ ভরিয়া গুরুর সেবা করিতে লাগিলেন।

উৎসব আমোদে কয়েক দিন গেল। স্বামিজী খেতরি হইতেই আমেরিকায় যাত্রা করিলেন। জগমোহনলাল, স্বামিজীকে বোম্বাই পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মহারাজ স্বয়ং স্বামিজীর সহিত জয়পুর পর্য্যন্ত আসিলেন। জগমোহনলালসহ স্বামিজী বোম্বাই পৌঁছিলেন। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি

সংগ্রহ করিয়া লওয়া হইল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে (বাঙ্গালা ১৩০০ সনের জৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি) পেনিনস্থলা নামক জাহাজে চড়িয়া বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করিলেন।

জাহাজ যাইয়া—উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে বাঙ্কুবার নগরে ভিরিল। এখান হইতে রেলে চড়িয়া তিন দিনে তিনি চিকাগো নগরে পৌঁছিলেন। এক প্রথম শ্রেণীর হোটেলে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। স্বামিজীর পক্ষে যেমন সেই দেশ, দেশের লোক এবং তাহাদের আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ নূতন, সে দেশ-বাসীর পক্ষে কিন্তু স্বামিজী তাহার চেয়েও অধিকতর নূতন—রাস্তায় বাহির হইলেই ছেলের দল এই অদ্ভুত পোষাকপরা লোকটির উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিত। কিন্তু সহিয়া লওয়া ছাড়া সেই অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় ছিল না।

জিনিষপত্র গুছাইয়া একটু স্থির হইতেই ২।৪ দিন গেল। তখন যে জন্য তিনি আমেরিকায় গিয়াছেন তাহার সন্ধান লইতে লাগিলেন। খোঁজে জানিতে পারিলেন যে, যার তার পক্ষে ধর্ম্মমহাসভায় যাইয়া বক্তৃতা করিবার উপায় নাই। তথায় বক্তৃতা করিতে তাঁহারাই পারিবেন, যাঁহারা কোনও ধর্ম্মসমাজ হইতে প্রতিনিধি হইয়া যাইবেন।

সকল জানিয়া শুনিয়া স্বামিজী বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন—কেননা এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় যে বৃথা হইতে চলিল। তিনি আর কিছু কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া বোষ্টননগরে চলিয়া গেলেন।

উহা আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূলে স্থিত একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। এইখানে রেলগাড়ীতে এক বৃদ্ধারমণীর সহিত স্বামিজীর পরিচয় হইল, তিনি পরম সমাদরে ইঁহাকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিলেন।

আমেরিকার লোক সকল অতিশয় অতিথিপরায়ণ হইলেও, বৃদ্ধা এই অদ্ভুত মানুষটী লইয়া আমোদ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং বহু আত্মীয়-স্বজনকে এই অপূর্ব্ব পদার্থ দেখাইয়া একটা বিপুল আনন্দের ব্যাপার সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন। বহুলোককে এজন্য পত্র লেখা হইয়াছিল।

স্বামিজীর মনে এখন একমাত্র চিন্তা কি করিয়া "সর্ব্বধর্ম্ম-মহাসভায়" প্রবেশ করা যায়। তিনি এই আশ্রয়দাত্রী রমণীর ব্যবস্থা সবই বুঝিতেছিলেন, তবু নীরবে সমুদায় সহিয়া লইলেন। অন্তর্য্যামীও এই একনিষ্ঠ সাধকের কামনা পূরণের জন্য এক অদ্ভুত ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অশান্তি অমঙ্গলের মধ্য দিয়া ভগবান পরম শান্তি ও অসীম মঙ্গলের পথ খুলিয়া দিলেন।

বোষ্টনের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে মিঃ জে, এইচ্, রাইট্ সাহেবের বাড়ী। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। রাইট্ মহোদয় স্বামিজীর সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং আলাপে এই নবীন সন্ন্যাসীর বিদ্যাবুদ্ধি ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হন। ইনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া বিবেকানন্দকে সর্ব্বধর্ম্ম মহা-সভায় যাইবার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

মিঃ বণি নামে রাইট্ সাহেবের একজন বন্ধু, ধর্ম্মমহাসভায়

যাঁহারা প্রতিনিধি হইবেন তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবার কর্ত্তা ছিলেন। মিঃ রাইট্ এই বন্ধুর নিকট পত্র লিখিয়া বিবেকানন্দের পরিচয় দিলেন এবং বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিভার অশেষ প্রশংসা করিলেন। তারপর একখানা পত্র স্বামিজীর হাতেও দিলেন, উহাতে রাইট্ সাহেবের উক্ত বন্ধুর ঠিকানা লেখা ছিল। স্বামিজী বোষ্টন হইতে চিকাগো যাত্রা করিলেন।

পথে এই পরিচয়ের পত্রখানা হারাইয়া গেল। সুতরাং চিকাগো আসিয়া স্বামিজীকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইল। তিনি না চিনেন সেখানকার পথঘাট, না চিনেন একটা লোক। কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও আশা মত উত্তর পাওয়া যায় না, বরং সকলেই ভ্রূকুটি করিয়া তাড়াইয়া দেয়। স্বামিজী সন্ধ্যাকালে চিকাগো পৌঁছিয়াছিলেন। কোথাও আশ্রয় না পাইয়া শেষে ষ্টেসনেই ফিরিয়া গেলেন—একটা প্রকাণ্ড খালি প্যাকিং বাক্স পাইয়া উহার ভিতর ঢুকিয়া কোন প্রকারে শীতের দারুণ রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন পথে বাহির হইলেন, পথঘাট জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া—ঠাট্টা বিদ্রূপ শুনিলেন, গালিমন্দ খাইলেন, গলাধাক্কার ভয়ে অনেক স্থান হইতে পলাইলেন। এই অবস্থায় তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, পথশ্রমে ক্লান্ত এবং একান্ত হতাশ হইয়া এক রাস্তার পাশে বসিয়া পড়িলেন।

যেখানে তিনি বসিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখেই একটা অট্টালিকা। স্বামিজী রাস্তায় বসিয়া নিজের অবস্থা ও কর্ত্তব্য কি তাহা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সম্মুখের সেই অট্টালিকা

হইতে একটী রমণী বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি কি ধর্ম্মসভার প্রতিনিধি?" বিদুষী আমেরিকাবাসিনী এই অপূর্ব্ব গৈরিক বসনে সজ্জিত—প্রদীপ্ত প্রতিভায় মণ্ডিত— বিদেশী যুবককে দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন—ইনি নিশ্চয়ই ধর্ম্ম-সভায় যোগদিতে আসিয়াছেন। এই মাতৃহৃদয়া উদারপ্রাণা মহিলার নাম মিসেস্ জর্জ্জ ডব্লিউ হেইল। স্বামিজী এই দয়াবতী রমণীকে সকল বিবরণ বলিলেন। তিনিও স্বামিজীকে নিজের বাটী লইয়া গিয়া বিশেষভাবে পরিচর্য্যা করিলেন; তারপর স্বয়ং তাঁহাকে রাইট সাহেবের বন্ধুর বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন। স্বামিজীর সকল ভাবনা—সকল নিরাশা দূর হইল। তিনি পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিনিধিগণের সহিত মিলিত হইলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর এই মহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশন হইল। নানা বেশে বিভূষিত শত শত প্রতিনিধির মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে সকলেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। কেননা সেই পরম সুন্দর মূর্ত্তিখানা গৈরিকবর্ণের বেশ ও হলদে পাগড়ীতে আরও অধিকতর সুন্দর দেখাইতেছিল।

প্রথম দিন সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে, প্রথমে কয়েকজন প্রতিনিধি বক্তৃতা করিলেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল প্রতিনিধি ধর্ম্মসভায় গিয়াছিলেন তন্মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং থিওসফি সমাজের প্রতিনিধি মিঃ চক্রবর্ত্তী সুন্দর বক্তৃতা করিলেন। ইহার পর স্বামিজীর বক্তৃতা।

তিনি দণ্ডায়মান হইয়াই বলিলেন "হে আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃমণ্ডলী!" এইরূপ কথা আর কোন বক্তাই বলেন নাই। সুতরাং স্বামিজীর এই সম্বোধনটুকু শুনিবামাত্র সেই আমেরিকার সুশিক্ষিত ছয় সাত হাজার শ্রোতা একত্র হাতে তালি দিয়া স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। দুই মিনিট ধরিয়া চারিদিক হইতে এমনি হাততালি হইল যে—সকলের কাণে যেন তালা লাগিয়া গেল। তারপর তিনি খুব সংক্ষেপে তাঁহার অভ্যর্থনার বক্তৃতা শেষ করিলেন। পরদিন সকল সংবাদ-পত্রে একবাক্যে লেখা হইল যে, স্বামিজীর বক্তৃতাই সকল শ্রোতার ভাল লাগিয়াছিল। আমেরিকার ঘরে ঘরে বিবেকা-নন্দের নাম কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

তারপর তিনি ১৫ই, ১৯শে, ২০শে, ২৬শে, এবং সভার শেষ দিন ২৭ শে সেপ্টেম্বর ধর্ম্মমহাসভায় বক্তৃতা করেন। প্রতিদিনই শ্রোতৃবর্গ বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত বেলা ১০টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সভামঞ্চে বসিয়া থাকিতেন। তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিলেই কর্ণবধিরকারী হাততালিতে সেই বিপুল সভাক্ষেত্র পূর্ণ হইয়া যাইত। বাস্তবিক সেই সভায়—পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের বক্তাদিগের মধ্যে বিবেকা-নন্দই শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের কাছে স্বীকৃত হইলেন। স্বামিজীর যশে আমেরিকা ভরিয়া উঠিল। গৃহস্থের গৃহ, সভাসমিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি হইতে এককালে শত শত নিমন্ত্রণ আসিয়া স্বামিজীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল—হাজার হাজার লোক

তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য আসিতে লাগিল। এই সময়ে স্বামিজীর বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর।

ইউরোপ, আমেরিকার খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দুধর্ম্মটা কিছু নহে—তাই তাহারা হিন্দুর দেশে মিশনরী পাঠাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিতেন। স্বামিজী ঐ সভায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, সেই বক্তৃতা শুনিয়া পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম্মাবলম্বীরাই বিস্মিত হন। ইহাতে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল ধর্ম্মের প্রতিনিধিরা সভায় গিয়াছিলেন—তাঁহারা নিজেদের প্রতিপত্তি নাশ হইল ভাবিয়া বিবেকানন্দের জাতি, কুল, স্বভাব বিষয়ে নানাপ্রকার গ্লানি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন—হিন্দুধর্ম্ম যে বিবেকানন্দের কথিত ধর্ম্ম নহে—সে কথা প্রচার করিয়া—স্বামিজীকে সভা হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন।

যাঁহারা অত বড় সভা ডাকিতে পারেন তাঁহারা ত আর শিশু নহেন যে, যা তা কথা শুনিয়া কাজ করিবেন। বিশেষতঃ তাঁহারা স্বামীজির বক্তৃতা শুনিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন—তাঁহার হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত স্বভাব, সর্ব্বজাতিতে সমতাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিবেকানন্দকে প্রতিবাদীদিগের কথার উত্তর দিবার জন্য সময় দিলেন। তিনি ২২ শে তারিখে "বেদান্তের সহিত বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতা শুনিয়া জগতের ধর্ম্মপ্রতিনিধিগণ পরম পরিতৃপ্ত হইলেন—আমেরিকাবাসীরা একেবারে বিমুগ্ধ হইল—নিন্দুকের দলের মুখ চূর্ণ হইয়া গেল।

২৫ শে তারিখে—"হিন্দুধর্ম্মের সার" বিষয়ে বক্তৃতা হইল। স্বামিজীর বক্তৃতায় এমন একটা আবেগ ও আবেশ উপস্থিত হইল যে শ্রোতারা একেবারে আপনা ভুলিয়া গেল। তিনিও আবেগ বশে সহসা নীরব হইলেন। তারপর মুহূর্ত্তেক বাদে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এই সভায়—হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা—হাত তুলুন।" সেই ভাববিভোর সপ্তসহস্র জনমণ্ডলী হইতে মাত্র তিন চারিখানা হাত উঠিল। উক্ত দৃশ্য দেখিয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীও দৃপ্ত-সিংহের ন্যায় ভৈরব গর্জ্জনে সভ্যগণের হৃদয় ভীত ত্রস্ত করিয়া কহিলেন "তবু তোমরা আমার ধর্ম্মের সমালোচনা করিবার স্পর্দ্ধা রাখ ?" স্বামিজীর সেই ব্রহ্মচর্য্যজনিত ওজঃপূর্ণ মুখমণ্ডল, অগ্নি-বর্ষী প্রদীপ্ত নয়নদ্বয়, গৈরিক উষ্ণীষমণ্ডিত উন্নত মস্তক ও অপূর্ব্ব বাগ্‌বিভূতিতে সভ্যমণ্ডলী নিজেদের হীনতা অজ্ঞতা অনুভব করিয়া নীরবে মাথা নোয়াইয়া রহিলেন, স্বামিজীর আমেরিকা গমন সার্থক হইল—শিষ্য মণ্ডলীর আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল—হিন্দুধর্ম্ম জয়যুক্ত হইল।

অদ্ভুত পোষাকের জন্য, অপরিচিত বলিয়া কিছুদিন আগেও যিনি রাস্তার ছেলেদের কাছে—গৃহস্থের বাড়ীতে—তাড়া খাইয়াছেন, মুটে মজুর গাড়োয়ানেরা পর্য্যন্ত যাঁহাকে ঠকাইতে ছাড়ে নাই, আজ তিনি রাজাধিরাজের চেয়েও অধিক সম্মানিত। তাঁহার একটা কথা শুনিবার জন্য—তাঁহার সহিত একটু দেখা করিবার জন্য—কত পণ্ডিত, কত ধনী, কত সম্ভ্রান্ত লোক ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। একদিন যিনি সামান্য খাদ্য বা অর্থের জন্য লোকের দ্বারে যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই—আজ তাঁহাকে রাজার

উপযুক্ত খাদ্য এবং শতসহস্র মুদ্রা দিবার জন্য কতলোক আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী, সংসারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই বলিয়া, তিনি তাহার কিছুই নিজহাতে লইলেন না।

অপর দিকে আবার একদল লোক ধর্ম্মজিজ্ঞাসু হইয়া স্বামিজীর শরণাপন্ন হইলেন। এই দলের মধ্যে শ্রীমতী লুইসা স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, তাঁহার নাম হইল স্বামী অভয়ানন্দ ; আবার শ্রীযুক্ত স্যাণ্ডাসর্বার্গ নামক জনৈক আমেরিকাবাসীও বিবেকানন্দের শিষ্য হইয়া সন্ন্যাসী হইলেন, তাঁহার নাম হইল স্বামী কৃপানন্দ। তিনি নিউইয়র্ক নগরে লোকশিক্ষা দিতে লাগিলেন, বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। এখানে অনেকগুলি আমেরিকাবাসী তাঁহার শিষ্য হইলেন। স্বামিজীর বক্তৃতাগুলি রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিয়া স্বামিজী তথায় তিনমাস কাল অবস্থিতি করেন। আমেরিকার ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করিয়া তিনি পৃথিবীর সকল দেশের লোকের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাইয়াও তিনি খুব আদর পাইলেন। বেদান্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। স্বামিজীর মধুর মনমাতান উপদেশ শুনিবার জন্য নরনারী ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া আসিত। বহু ইংরেজ মহিলা আসনের অভাবে মাটিতে পা গুটাইয়া বসিয়া তন্ময়ভাবে তাঁহার উপদেশ শুনিত। কুমারী মার্গারেটলোব্‌ল্ নাম্নী এক মহিলা স্বামিজীর শিষ্যা হইয়া সন্ন্যাস লইলেন। তিনিই পরে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

তিনমাস পরে আমেরিকায় ফিরিয়া আসিয়া আবার স্বামিজী কতকগুলি বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতাগুলি কর্ম্মযোগ নামে ছাপান হইয়াছে। যে কোন ভারতবাসীর পক্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় বালকবালিকা যুবকযুবতীর পক্ষে এই পুস্তকখানা অবশ্য পাঠ্য। স্বামিজীর সকল বক্তৃতার মধ্যে এইটীই প্রধান বলিয়া মনে হয়। ইহার পরে ভক্তিযোগ ও স্বীয় আচার্য্যদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। উহাও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

বিবেকানন্দের অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অকাট্যযুক্তি এবং হিন্দু-ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় আমেরিকায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার পদতলে জ্ঞানলাভের জন্য আশ্রয় লয়। এহেন অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমেরিকার লোক বিবেকা-নন্দের নাম দিয়াছিল 'সাইক্লোনিক হিন্দু' অর্থাৎ প্রলয়ঙ্কর হিন্দু। ধর্ম্মমহাসভার বক্তৃতা শুনিয়া আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ নিউইয়র্ক হেরলড্ নামক পত্রের সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে, 'হিন্দুর ন্যায় পণ্ডিত জাতির মধ্যে খ্রীষ্টান প্রচারক পাঠানো যে অতিশয় বোকামীর কাজ, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার পর তাহা বেশ বুঝিতেছি।' বাস্তবিক তিনি আমে-রিকার ধর্ম্মসমাজে প্রলয় উপস্থিত করিয়াছিলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে আবার তিনি ইংলণ্ডে যান। নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত তথায় থাকিয়া প্রচার করেন। দিনরাত পরিশ্রম করিয়া মাঝখানে স্বামিজীর শরীর বড়ই খারাপ হইয়া পড়ে। এজন্য তিনি কয়েকজন শিষ্য-শিষ্যা লইয়া ইউরোপের কতিপয় রাজ্য ভ্রমণ করিয়া আসেন। ইতিপূর্ব্বেই বিবেকানন্দের সহিত

আলাপ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ম্যাক্স মুলর 'রামকৃষ্ণের জীবনী' প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

৫

স্বামিজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে আমেরিকায় যান; আড়াই বছর পর ইউরোপে গমন করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রায় সাড়ে তিনবছর বেদান্তের মত প্রচার করিয়া দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করেন। তদনুসারে প্রিন্স্ রিজেন্ট্ লেওপোল্ড নামক জাহাজে চড়িয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি ভারতবর্ষে —সিংহলের অন্তর্গত কলম্বো নগরে উপস্থিত হন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে কাপ্তেন সেভিয়ার এবং তাঁহার পত্নীও মিঃ গুড্উইন আগমন করেন। ইঁহারা স্বামিজীর শিষ্যত্ব লইয়াছিলেন।

কাপ্তেন সেভিয়ার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে চাকরী করিয়াছিলেন। ইঁহারই অর্থের সহায়তায় আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী মায়াবতী নামক স্থানে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামিজীর পাশ্চাত্য শিষ্যগণ তথায় বাস করিয়া—বেদান্ত আলোচনা এবং সাধনাদি করিয়া থাকেন।

বিবেকানন্দ ভারতে ফিরিয়া আসিয়া কলম্বো হইতে হিমালয়ের অন্তর্গত আলমোড়া পর্য্যন্ত গমন করেন। তিনি যে সকল স্থানে উপস্থিত হন, তথায়ই এমন আদর, সম্ভ্রম ও উৎসাহের সহিত অভ্যর্থনা পান যে পূর্ব্বে কোন দিনই কেহ এমন সম্মান পান নাই। এই উপলক্ষে তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন, বাঙ্গালায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে। বহির নাম 'ভারতে-বিবেকানন্দ'; প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই বহিখানা বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়া উচিত।

ভারতে ফিরিয়া আসার পর তিনি নানা ব্যাপারে এমন পরিশ্রম করিতেছিলেন যে তাহাতে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। সুতরাং তিনি কিছুদিনের জন্য ধর্ম্ম-প্রচারের কাজ হইতে বিরত হইলেন। কিন্তু তিনি যে সকল মত এতদিন ব্যক্ত করিতেছিলেন, তাহার অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্য করিবার জন্য লোক তৈয়ার করা আবশ্যক। সুতরাং তিনি বেলুড ও হিমালয়ে দুইটী মঠ স্থাপন করিলেন। দেশের উন্নতির জন্য কি কি কাজ করিতে হইবে, তজ্জন্য "রামকৃষ্ণ মিশন" প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশবাসীদিগের জীবন রক্ষার জন্য বিবেকানন্দ "সাহায্য সমিতি" স্থাপন করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা হইল। দুই বছর পরে প্লেগ আরম্ভ হইল—স্বামীজি নিজে উপস্থিত থাকিয়া 'সেবা সমিতি' গডিলেন। ভগিনী নিবেদিতা সেই সমিতির নেত্রী হইলেন, কর্ম্ম করিবার ভার লইলেন। সেবকগণ অলিগলি ঘুরিয়া রোগীর সেবায় দেহ-মন নিয়োগ করিল। সে সেবার তুলনা নাই—সে শুশ্রূষার উপমা জগতে মিলে না।

স্বামীজির অদম্য উৎসাহ, প্রচণ্ড কর্ম্মক্ষমতা এবং উন্মাদক উপদেশে সমুদয় দেশের লোকের প্রাণ যেন অতি দ্রুত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। পৃথিবীর চারিদিকে একটা কর্ম্মশীলতার—চঞ্চলতার সাড়া পড়িয়া গেল। মান্দ্রাজে এক মঠ স্থাপিত হইল, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তথাকার অধ্যক্ষতা লইলেন, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য স্বামী অভয়ানন্দ, অভেদানন্দ

ও সারদানন্দ প্রেরিত হইলেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলণ্ডে প্রচারের ভার পাইলেন হরিপ্রিয়া (মিসেস্ পিকেট্); লঙ্কার প্রচারক হইলেন স্বামী শিবানন্দ। লোকশিক্ষার সাহায্যের জন্য ব্রহ্মবাদিন্, প্রবুদ্ধভারত ও উদ্বোধন নামে তিনখানা পত্রিকা প্রকাশিত হইল। বস্তুতঃ চারিদিকে শুধু কর্ম্মের তাড়া পড়িয়া গেল।

আবার স্বামীজির শরীর ভাঙ্গিয়া উঠিল। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে তিনি স্বাস্থ্য লাভের আশায় ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাত্রা করিলেন। এবার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো নগরে একটী 'বেদান্ত সোসাইটী, ও শান্তি আশ্রম স্থাপিত হইল।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে এক ধর্ম্ম মহাসভার অধিবেশন হইল। স্বামীজি নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গেলেন, হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। যেটুকু স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন আবার তাহা নষ্ট হইয়া গেল। তিনি মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন।

দেশে ফিরিয়া তিনি সাধুগণের সাহায্যার্থ "রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম," যুবকগণের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার জন্য কাশীধামে "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম", ছাত্রগণের অধ্যয়নের জন্য 'রামকৃষ্ণ পাঠশালা, এবং দরিদ্র ও অনাথগণের সাহায্যকল্পে "রামকৃষ্ণ হোম" স্থাপিত করিলেন।

এই সময়ে জাপান দেশেও এক ধর্ম্মমহাসভার অধিবেশন হয়। কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোক স্বামীজিকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য ভারতে আসেন। শরীর খুবই অসুস্থ বলিয়া তিনি তথায় যাইতে পারিলেন না।

অনেকে বলেন বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম্ম মানিতেন না—উহার ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করিতেন। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। সুদীর্ঘ

কালে হিন্দুধর্ম্মের আচার ব্যবহারে যে আবর্জ্জনা জমিয়াছে তিনি তাহারই সংস্কারে মনোযোগী ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিষয় বক্তৃতা করিবার জন্যই আমেরিকায় যান। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি বেলুড় মঠে দুর্গোৎসব আরম্ভ করেন, পরে লক্ষ্মী ও শ্যামা পূজার ব্যবস্থা করেন। ঐসকল দেবকার্য্য যাহাতে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ভাবে সুসম্পন্ন হয় সেজন্য স্বামীজির তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। তিনি একবার কালীঘাটে যাইয়া মায়ের মন্দিরে—গড়াগড়ি দেন—হোম করেন। তিনি স্পষ্টই বলিতেন "আমি (শাস্ত্রমর্য্যাদা) ধ্বংস করিতে আসি নাই, পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।"

অনবরত অপরিমিত পরিশ্রমে সেই বীরদেহের স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনত হইয়া পড়িল। তিনি কয়েকদিন মায়াবতী আশ্রমে বিশ্রাম করিয়া বেলুড়ে আসেন। ছাত্রগণের ব্যাকরণ ও বেদ-শিক্ষার জন্য এখানে একটী শ্রেণী স্থাপিত হইয়াছিল। স্বামীজি স্বয়ং তথায় পড়াইতেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার অমাবস্যার পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্নে স্বামীজি ছাত্রদিগকে পাণিনী ব্যাক-রণ শিক্ষা দিয়া অপরাহ্নে বেদ বিষয়ে উপদেশ দেন। অধ্যাপনা শেষ হইলে কিছুকালের জন্য একটু বেড়াইয়া আসেন। ক্রমে বেলা শেষ হইয়া যায়।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে স্বামীজি ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন। এই ধ্যান ক্রমে মহা সমাধিতে পরিণত হয়। রাত্রি ৯টার সময় তাঁহার আত্মা দেহ ছাড়িয়া অনন্তে মিলাইয়া যায়।